মধ্যযুগের অনুশাসনমূলক কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি ও কাব্য

মর্জিনা খাতুন

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি অভিঘাতের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালায় ইসলামি শাসনের সূচনা হয়। তবে এরও বহু পূর্বে (আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর আগে) থেকে আরব বণিকদের সাথে ভারতবর্ষের যোগ স্থাপিত হয়েছিল। তবে তা ছিল শুধুমাত্র বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরে ইসলামের প্রচার প্রসারের যুগে (আনুমানিক সপ্তম শতকের পর থেকে) সচেতনভাবে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আরব বণিকদের সাথে প্রচুর সুফি ও আউলিয়া এ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। মূলত তাঁদের ক্রিয়াকুশলতার ফলশ্রুতিতে এ দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই এক ঐশ্লামিক বাতাবরণ তৈরি হয়। এ দেশের মানুষ সহজ সুন্দররূপে গ্রহণ করেছিল সুফি সাধকদের। অনেক সুফি-আউলিয়া এ দেশের রাজাদের কাছ থেকেও সহযোগিতা ও সম্মান লাভ করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ হলায়ূধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থে সেখ জালালুদ্দিন তাব্রেজী নামে এক পিরের অলৌকিক ক্ষমতা শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

তবে তুর্কি শাসন প্রবর্তনের প্রেক্ষিতেই বস্তুত এ দেশে ইসলামের ভিত দৃঢ় সংহত হয়। সে যাইহোক, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সুফি-আউলিয়ারা এ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেও তাঁরা কখনোই জনমানসের ওপর ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেননি। ইসলামের বিশ্বভাতৃত্বেরবোধ; ধর্ম প্রচারকদের ঔদার্য ও সোহার্দ্যে আকৃষ্ট হয়ে অন্ত্যজ শ্রেণির বঙ্গজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। যে ধর্মপ্রচারকরা প্রথম দিকে এ দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাঁরা কখনোই প্রচারের মাধ্যম হিসাবে শরিয়তি ইসলামকে অবলম্বন করেননি। আল্লাহর একত্মে বিশ্বাস স্থাপন এবং নবি মুহম্মদের প্রতি আনুগত্য ছিল তাঁদের বিচারে ইসলামের মাপকাঠি। সেই অনুসারেই তারা এদেশে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। এতে বেশ কিছু সুবিধা ও অসুবিধা তৈরি হয়েছিল। সহজ সরলরূপে প্রচারিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে অতিরিক্ত আগ্রহ তৈরি হয়; দেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতি, বিশেষত এতদিনের চর্চিত ধর্মবোধের সঙ্গে বিশেষ কোনো বিরোধের সম্পর্ক না থাকায় জনগণ দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়। এতে সমস্যা হয় উল্টো দিক থেকে। তত্ত্বগতভাবে ইসলাম এমন একটা ধর্মভাবনা ও জীবনব্যবস্থা যেখানে দেশাচার লোকাচারের

বিশেষ স্থান নেই। বৈশ্বিক ঐশ্লামিক সংস্কৃতিই ইসলামের প্রথম ও শেষ কথা। বৈশ্বিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় সুফি পন্থায় ধর্মপ্রচার হওয়ার কারণে। এর ফল স্বরূপ দেখা যায়, গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে ঐশ্লামিক জ্ঞান নিরপেক্ষ নামসার নিরবলম্ব নিরক্ষর মুসলমান সমাজ। নবগঠিত এই মুসলমান সমাজের যাপিত জীবনে সেরকম কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। বরং ঐতিহ্যেরই অনুবর্তন ঘটতে থাকে। এতদিনের লালিত সংস্কার, আচার-আচরণ সমস্ত কিছুই সামান্য নাম বা রূপ পরিবর্তন করে ঠাঁই নেয় একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মে। শরিয়ত না জানা মুসলমান সমাজ নিজের অজানতেই তৈরি করে নেয় এক নতুন সমাজ যাকে পণ্ডিতেরা বলেন 'লৌকিক ইসলাম'।

বাংলায় ইসলামের দ্রুত প্রচার প্রসার হলেও এখানে মুসলমান সমাজের আলাদা আইডেন্টিটি তৈরি হতে অনেক সময় লাগে। প্রথম দিকে যে নব মুসলিমরা তাঁদের ধর্মবোধ সম্পর্কে একেবারেই সচেতন ছিল না তারাই ধীরে ধীরে এ বিষয়ে সচেতন হতে থাকে। পনেরো শতকের গোড়ার দিক থেকেই বাংলাদেশে সুফি সাধকদের পাশাপাশি শাস্ত্র জ্ঞানে জ্ঞানী আলেম ওলামা সমাজের দেখা মেলে। এই ওলামা সম্প্রদায় মুসলমান সমাজকে ইসলামের প্রকৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হয়। ঘটমান কিছু বৃত্তান্তের প্রেক্ষিতে তারা এ বিষয়ে আলাদা করে উদ্যোগী হতে বাধ্য হয়েছিল। ততদিনে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রেক্ষিতে বাংলার সমাজচিত্রটাই গেছে বদলে। নিম্নবর্ণীয় যে হিন্দু সমাজ উচ্চবর্ণের অত্যাচার থেকে বাঁচার তাগিদে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল সেই নিম্নবর্গীয় সমাজ এখন হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই নতুন করে বাঁচার রসদ খুঁজে পেল। অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা কমে এল। বিষয়টা মুসলমান সমাজের দিক থেকে উপভোগ্য নয়। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার এর মতো হয়ে উঠলেন যবন হরিদাসের মতো কেউ কেউ। ক্রমশ চৈতন্যের প্রেমধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠছিল মুসলমান সমাজের এক একজন। সুফি সাধকদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা অতিরিক্ত ধর্মীয় উদারতা বশত চৈতন্যবন্দনা সহ হাজারও বৈষ্ণব পদ রচনা এ সব করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিলেন। এই অবস্থায় মুসলমান সমাজকে নিজ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ রাখার জন্য আলাদা করে ব্যবস্থা নেওয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। আবশ্যক হয়ে পড়েছিল সমাজের তৃণমূল স্তরে প্রকৃত ইসলামকে প্রচার করা, প্রতিষ্ঠা দেওয়া, কোরান হাদিস-এর সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানো। এই কাজ করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল ভাষা সমস্যা। কোরান হাদিস আরবি ভাষায় লেখা; অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের ভাষাও হয় আরবি না হয় ফারসি। মুসলমান সমাজের সাধারণ শ্রেণি এর কোনোটাতেই দক্ষ নয়। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করতে হয়। কিন্তু সে পথেও রয়েছে বাধা। ঐশী বাণীকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করার ব্যাপারে দ্বিধা ছিল, ছিল ভয়। পরিস্থিতির চাপে অবশ্য একটা সময় এই ভয় কেটে যেতে থাকে, দ্বিধাহীন হন কেউ কেউ। সূত্রপাত হয় বাংলা ইসলামি অনুশাসনমূলক কাব্য ধারার। ড. আহমদ শরীফ বাংলা ইসলামি অনুশাসন মূলক কাব্য ধারার পরিপ্রেক্ষিতের কথা বলতে

গিয়ে তিনটি চিন্তাসূত্রের সন্ধান দিয়েছেন — ১. পর্তুগিজদের দৌরাত্মে আরবের সঙ্গে চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক সম্পর্ক লোপ পেলেও চট্টগ্রাম হয়ে সমুদ্রপথে হজ্ব-যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। উত্তর ভারতের হজ্বযাত্রীরাও এই পথে যাতায়াত শুরু করে। ২. সতেরো শতকে ইসলাম আর প্রসারকামী তথা প্রচারশীল ছিল না। তখন মুসলিম সমাজ সমাজ সংগঠনে ও ইসলাম-শিক্ষায় ব্রতী হয়েছে, সমাজে এসেছে স্থিতিশীলতা। ৩. মুঘল বিজয়ের ফলে উত্তর ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি হয়। এর ফলে ওদেশ থেকে শাস্ত্রবিদরা যেমন এদেশে আসতে থাকেন তেমনি এদেশের লোকেরাও উত্তর ভারতে গিয়ে শাস্ত্রশিক্ষা করে আসতে থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞানে জ্ঞানী এই দেশীয় লোকেরাই তাদের সমাজের হেফাজতের লক্ষ্যে অনুশাসনমূলক কাব্য রচনায় যত্নশীল হয়।

শাস্ত্রজ্ঞ আলেম ওলামা সমাজ সেদিনের কবি সমাজের সহযোগিতায় আরবি-ফারসি ভাষায় রচিত শাস্ত্রগ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ করে জনগণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এগুলিই পরে ইসলামি অনুশাসনমূলক কাব্যধারা নামে পরিচিত হয়। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে এই অনুশাসন ধর্মী রচনাগুলি। একান্ত ধর্মীয় বিষয়াশ্রিত বলে অমুসলমান সমাজে এই কাব্য ধারার তেমন প্রচার প্রসার ছিল না। তবে মুসলমান সমাজে এর প্রচলন ছিল যথেষ্ট মাত্রায়। গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে এই সব কাব্য পঠিত ও চর্চিত হত। সেদিনকার বাঙালি মুসলমানের সমাজ সংস্কৃতির প্রামাণ্য পরিচয় ধরা আছে এখানে।

অনুশাসনধর্মী কাব্য রচনা শুরু হয় ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে এবং এই ধারার কাব্য রচনার প্রয়াস চলেছিল প্রায় উনিশ শতক পর্যন্ত। একটা সচেতন উদ্দেশ্য তথা ধর্মীয় উপদেশ দেওয়ার জন্যই বাক্যগুলি রচিত বলে কবিরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ছন্দের বন্ধনে শুধু মাত্র নিজেদের বক্তব্য পেশ করে গেছেন। জনগনের মনোরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। এই ধারায় অনেক কবি কাব্য রচনা করে সেই সময়ে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - শেখ পরাণ, শেখ মুত্তালিব, নেয়াজ, আশরাফ, আলাউল, মুজাম্মিল, আব্দুল হাকিম, ফসীহ প্রমুখ।

শেখ পরাণ

কবি সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য এখনও পর্যন্ত সেরকম ভাবে পাওয়া যায়নি বলে তিনি মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় অনালোচিতই রয়ে গিয়েছেন। তাঁর নামে দুখানি কাব্য প্রচারিত, যথা— 'নূরনামা', 'নসীহৎনামা'। কিন্তু কোনোটিতেই কাব্য রচনার সময়কাল পাওয়া যায় না। তাঁর সম্পর্কে অল্পবিস্তর যা কিছু আজ পর্যন্ত জানা গিয়েছে তা পুত্র শেখ মুত্তালিবের কাব্য থেকে। শেখ মুত্তালিব তাঁর 'কিফায়তুল মুসল্লিন' গ্রন্থের নানা অংশে নিজেকে পরাণ তনয় ও পরাণ-নন্দন বলে উল্লেখ করেছেন:

১. কিফায়তুল মুসল্লিন শুন দিয়া মন/বঙ্গ ভাষে কহে শেখ পরাণ-নন্দন।[১]

২. সীতাকুণ্ডু গ্রামে শেখ পরাণ/তাহান নন্দন হীন মুত্তালিব ভাণ।[২]

৩. মৌলবী রহমতুল্লাহ সর্ব গুণ ধাম/চর্তুদশ এলেম অবধান অনুপাম/তাহান আদেশে শেখ পরাণ-নন্দন/হীন মুত্তালিব কহে শাস্ত্রের বচন।[৩]

শেখ মুত্তালিবের উপরোক্ত ভণিতার সূত্রে ড. আহমদ শরীফ মনে করেন কবি শেখ পরাণই শেখ মুত্তালিবের পিতা। তাঁর মতে-পিতা খ্যাতিমান না হলে পুত্র আত্মপরিচয়ে পিতার নামোল্লেখ করতেন না। আর কবি খ্যাতির চেয়ে অন্য কোনো খ্যাতি বেশি প্রসার লাভ করে না। তাই আমরা মুত্তালিবকে কবি পরাণের পুত্র বলেই মনে করি।[৪] শেখ মুত্তালিবের কাব্য থেকে কবি পরাণের বাসস্থান সম্পর্কে জানা যায় "সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরাণ সুজন/তাহান নন্দন হীন মুত্তালিব ভাণ।" (কিফায়তুল মুসল্লিন) আত্মপরিচয় সূত্রে কবি মুত্তালিব তাঁদের পারিবারিক জীবনের কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে জনৈক মৌলবী রহমতুল্লার কাছে পালিত হন তিনি। এ থেকে বোঝা যায় শেখ পরাণ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন না; অন্নের অনটনই তাঁকে অন্যের আশ্রয় নিতে বাধ্য করে।

কবি পরাণের সময়কাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ নানা মত দিয়েছেন। তবে তাঁরা প্রত্যেকে নির্ভর করেছেন কবি পুত্র শেখ মুত্তালিবের উপর। শেখ মুত্তালিব তাঁর কাব্য রচনার যে সন-তারিখ দেন তা থেকেই পণ্ডিতগণ মোটামুটিভাবে শেখ পরাণের সময়কাল সম্পর্কে ধারণা দেন —"এসলাম এবাদত নামাজ সমাপ্ত/সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত।/সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম/যেই দিন সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম" [৫] (কিফায়তুল মুসল্লিন)। ড. এনামুল হক উপরোক্ত স্তবকের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে-'আরবী আবজাদ রীতি অনুসারে পুস্তক সমাপ্তির তারিখ এইরূপ : ইবাদত-৪৭৭, নাম- ৯১, তমাম- ৪৮১ অর্থাৎ ১০৪৯ হিজরী বা ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ।[৬] এনামুল হকের মতানুযায়ী ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে কবি তাঁর কিফায়তুল মুসল্লিন কাব্যখানি রচনা করেন সেই অনুযায়ী শেখ পরাণ তারও কয়েক দশক আগে জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। যদি তাই হয় তাহলে পরাণকে ষোড়শ শতকের শেষার্ধের কবি বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হক আরও বলেন - '১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে কবির বয়স ৩৯ বৎসরও হয়, তিনি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির অল্প বয়সে অর্থাৎ ১৪ কি ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা মারা গিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের পরের দিকে কবি শেখ পরাণ জীবিত ছিলেন না, অন্তত ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে কবি শেখ পরাণ যে জীবিত ছিলেন না, তাহাতে কোনা সন্দেহ নাই।'[৭] আহমদ শরীফের মতে-'শেখ মুত্তালিব শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। ১৬৩৮ সনে মুত্তালিবকে ৩৫ বছর বয়স্ক এবং মুত্তালিব পিতার যদি মধ্য বয়সের সন্তান হন, আর পিতা পুত্রে বয়সের তফাৎ ৪০ বছর ধরে নিয়ে হিসেব করলে মুত্তালিবের জন্ম সন ১৬০৩ এবং তাঁর পিতার জন্ম সন ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ বলে অনুমান করা যায়। শেখ মুত্তালিব যদি দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হন তাহলে পরাণের মৃত্যুসন দাঁড়ায় ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ। অতএব পরাণের জীবৎকাল মোটামুটি ১৫৬০-১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ বলে মনে করা যায়।' [৮]

কবি পরাণের কাব্যে উল্লিখিত মধ্যযুগের দুই বিশিষ্ট কবির নামোল্লেখ থেকে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে মোটামুটি আন্দাজ করা চলে। কবি 'নূরনামা' কাব্যে সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ'এর উল্লেখ করেছেন—"শাস্ত্রনীতি কথা কহি কর অবধান/ফাতেমাকে বিভা কৈল আলি মতিমান।/নবীবংশ রচিছন্ত সৈয়দ সুলতান।"[৯]

কবি সৈয়দ সুলতান 'নবীবংশ' রচনা শুরু করেন ১৫৮৪-৮৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। যদি তাই হয় তাহলে শেখ পরাণ তাঁর পরে কাব্য রচনা শুরু করেছেন এ দিক থেকে তাঁকে সৈয়দ সুলতানের সমসাময়িক বা পরবর্তী কবি বলা যেতে পারে। আবার পরাণ তাঁর 'নসিহতনামা' কাব্যে হাজী মুহম্মদ ও তাঁর কাব্যের কথা বলেছেন-"ছুরতনামার মধ্যে ইমানে ছিফত/রচিচ্ছেন্দ হাজী মোহাম্মদ ভাল মত।/তেকারণে এথা মুঞি না কৈলুং সমাপ্ত/কিঞ্চিত কহিলুং বুঝিতে ইঙ্গিত।/সএক পরাণে কহে শুন গুনিগণ/সভানের পদতলে করম নিবেদন।"[১০] এসব উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় কবি পরাণ সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদের সমসাময়িক ছিলেন। তবে তাঁদের কাব্য জনসমাজে প্রচারিত হওয়ার পরই তিনি কাব্য রচনা শুরু করেন। বহুল জনপ্রিয়তার জন্যই মনে হয় কবি পরাণ অগ্রবর্তী কবি হিসেবে তাঁদের নামোল্লেখ করেছেন।

শেখ পরাণের নামে যে দুটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তা ইসলামি অনুশাসন বিষয়ক যথা- 'নূরনামা', 'নসিহতনামা'। 'নূরনামা' কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা থেকে এর শুরু। 'রোজ-ই-আজল' অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি নূর-ই-মুহম্মদীর সৃষ্টির কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে এসেছে সৃষ্টিতত্ত্বের নানা আনুষঙ্গিক বিষয়। 'নসিহতনামা' কবির মৌলিক রচনা নয়। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-"ফারসি ভাষে সেই কথা আছিল লিখন/বাংলা ভাষা কৈলুং বুঝিতে কারণ।"[১১] কাব্যের মূল বিষয় কোরান ও হাদিস সংক্রান্ত আচার-আচরণ। এই সূত্রে কবি ওজু ও নামাজের ফরজ, বিভিন্ন ওজুর নাম, গোসলের ফরজ, চার কুর্সী, মজহাবের কথা, সপ্ত ইমাম প্রসঙ্গ, রস ও দেহের লোমের সংখ্যার বিবরণ ও আরও নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আফজাল আলী

মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে আফজাল আলী অন্যতম। তিনি 'নসিহতনামা' নামে কাব্যের রচয়িতা। তাঁর নামে বৈষ্ণবীয় ঢঙে লিখিত কিছু পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর কাব্য বিচারে অনুমান করা যায় তিনি আদি মুসলিম কবিদের অন্যতম। এনামুল হকের মতে-"নসিহতনামা'র যে পাণ্ডুলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। ইহা হইতে কবির সম্বন্ধে একটা সাধারণ প্রাচীনত্বের ধারণা জন্মে।"[১২]

'নসিহতনামা'র পাণ্ডুলিপি অনুলিখিত হয়েছে মধ্যযুগের অন্য এক কবি মহসিন আলী কর্তৃক। তিনি 'মোকাম-মঞ্জিল কথা' নামক কাব্যের রচয়িতা। তাঁর নামে কিছু পদও পাওয়া যায়। 'নসিহতনামার অনুলিখন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-"এই পুস্তক লিখিলাম মোছন আলী হীনে/সাঙ্গ হৈল চব্বিশ মঘীর বারই আশ্বিনে।"[১৩] মুহম্মদ এনামুল হক উপরোক্ত

স্তবকের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ ভাবে- 'নসীহৎনামা ১১২৪ মঘীতে অর্থাৎ ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে নকল করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ইহা ১০২৪ মঘী অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের নকলও হইতে পারে।'[১৪] কবির বাসস্থান ছিল চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত মিলুয়া গ্রামে : "চাটি গ্রাম মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র এক গ্রাম/মিলুয়া করিয়া আছে সে গ্রামের নাম।"[১৫] (নসীহৎনামা)

কবির পিতা ছিলেন ভঙ্গু ফকির। তিনি একজন আলিম ও দরবেশ ছিলেন। কবি ছিলেন শাহ রুস্তমের শিষ্য। শাহ রুস্তম সম্বন্ধে কবি বলেন : "সেই গ্রামে হৈল এক ফকীর আল্লার।/এ চারি মঞ্জিল ভেদ দিল করতার।।/শাহা যে রুস্তম করি ছিল তার নাম।/আল্লার হইল কৃপা গুণে অনুপাম।।/গায়েবী মরতবা প্রভু তাহানে যে দিলা।/গায়েবীর ভেদ যত কহিতে লাগিলা।।/গায়েবী ফকির বলি দেশ দেশান্তর।/তান খেয়াতি একে একে হইল প্রচার।"[১৬] কবির এই উক্তি থেকে এনামুল হক তাঁর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন। তাঁর মতে "সাতকানিয়ায় এখনও রুস্তমের হাট, শাহ রুস্তমের দরগাহ বর্তমান। স্থানীয় লোকের মতে এই দরবেশ তিন-চারি শত বৎসরের প্রাচীন লোক। ইহা হইতে কবির সময় সম্বন্ধে একটা প্রাচীনত্বের ধারণা জন্মে।"[১৭] পির শাহ রুস্তমের সময়কাল ধরে হিসেব করলে আফজাল আলীকে ষোড়শ শতকের কবি বলা যেতে পারে। কবির অনুলিখিত পুথিতে সম্ভাব্য যে তারিখ পাওয়া গেছে কবি যে তার থেকেও প্রাচীন হতে পারেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় অন্যত্র। তাঁর একটি পদের ভণিতায় দেখা যায় : "ছৈয়দ পেরোজ শাহা সুধাময় অবগাহা/ভজ সখি সুরঙ্গ চরণ।"[১৮]

উপরোক্ত চরণে উল্লেখিত ছৈয়দ পেরোজ শাহা সম্ভবত সুলতান ফিরোজ শাহা। যদি তাই হয় তাহলে ইনি ইতিহাসে বর্ণিত নসরত শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। তাঁর সময়কাল ১৫৩২-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ। এনামুল হকের মতে 'ফীরুজ শাহকে সুলতান না বলিয়া বংশগত সয়্যিদ উপাধিতে ভূষিত করায়, মনে হইতেছে ফীরুজ শাহের যুবরাজ অবস্থায় কবি কোনো প্রকারে তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।' [১৯] এই যুক্তিতে আফজাল আলীকে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের সমসাময়িক বলে মনে করা যেতে পারে। আহমদ শরীফ কবির প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে- 'আফজাল আলীকে ষোলো-সতেরো শতকের কবি বলে অনুমানের পক্ষে দুটো বাধা আছে। এক, ভাষা অত্যন্ত অর্বাচীন। দুই, লেখকের নিষ্ঠাহীনতা। কোরান-হাদিসের নামে অনেক বানানো আরবি বাক্য তিনি তাঁর উক্তির সমর্থনে প্রয়োগ করেছেন, তাতে তাঁকে একজন প্রাচীন সাধক শাহ রুস্তমের সহচর শিষ্য বলে গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করি।'[১৯] শুধু তাই নয় কবির প্রাচীনতাই বাধা হওয়ার পেছনে তিনি আরো দুটি কারণ দেখিয়েছেন- ১. তামাক প্রসঙ্গ, ২. গাঁজা প্রসঙ্গ। কবি কাব্যে এই দুই মাদক সেবনের কুফল বর্ণনা করেছেন। যেমন : সংসারেত যে সকল তামাকু পিয়এ।/অন্তরে কালির বর্ণ হইয়া আছএ।।/তামাকুর পায়রবি করিয়া পঞ্চজন।/মুচি হন্তে কতল করিব নিরঞ্জন।।/তামাকু যে ক্ষতি করে, যেবা মাখি

দিছে।/আর যে সকল ভক্ষে- এই পঞ্চজন।/হিসাবেতে 'ছেহা' বর্ণ হইবে বদন।।/কিবা ভাল কিবা মন্দ নাহি বিচারএ/এক নলে মুখ দিয়া সকলে ভক্ষএ।[২০]

গাঁজা খাওয়ার বিরুদ্ধে কবি বলেছেন : আর স্বপ্ন দেখিলেন্ত গাঁজা যে পিয়ন।/সে সবের সর্ব অঙ্গ ইব্লিস বাহন।।/সে সবের সঙ্গতি যে মেলা করিবার।/নিষেদ করিছে নবী হাদিস মাঝার।[২১] তামাক ও গাঁজা সেবনের বিষয়টি আহমদ শরীফের মতে 'খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের আগে কোনো কবির পক্ষে বলা সম্ভব নয় এই কারণে যে তামাক এ দেশের সতেরো শতকের আগে চালু হয়নি।' এই সূত্রে আহমদ শরীফ মনে করেন- 'নসিহৎনামা' -প্রণেতা আফজাল আলি আঠারো শতকের লোক।' [২২]

'নসিহতনামা' ধর্মোপদেশ সংক্রান্ত গ্রন্থ। কাব্যের মধ্যে দরবেশ শাহ রুস্তম স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে আফজাল আলির মুখ দিয়ে ধর্মের তত্ত্ব কথা ব্যক্ত করেছেন। এই তত্ত্ব কথাগুলি কোরান ও হাদিস সমর্থিত। এই প্রসঙ্গে কবি বলেন : খোয়াবের যত বাণী আদ্যেত লেখিয়া।/তজবিজ করিল ফাজিলের পাশে নিয়া।।/উপহাস্য করে বুলি মোনাফেকগণ।/আয়েত হাদীছ লেখিয়াছি তেকারণ।।[২৩] (নসিহৎনামা)

ইসলামি অনুশাসনমূলক কাব্য সেযুগে বাংলায় সেরকম ভাবে রচিত হয়নি। পাপের ভয়ে বা অন্য যে কোনো কারণের জন্য হোক মানুষ এর থেকে দূরে থেকেছে। আফজাল আলীর কাব্যে কবিত্বের বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও তাঁর এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংশনীয়। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন- 'এই গ্রন্থে কোনো কবিত্ব নাই বটে, তবে ধর্মোপদেশ আছে। ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের উপদেশ বাংলায় বিশেষ প্রচারিত হইয়াছিল বলে মনে হয় না। এ-যাবৎ এই শ্রেণির বাংলা পুস্তক খুব কমই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে আফজাল আলীর নসিহৎনামা এই যুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করিবে।' [২৪]

হাজী মুহাম্মদ

শেখ পরাণ এবং সৈয়দ সুলতানের সমসাময়িক কবি ছিলেন হাজী মুহম্মদ। তাঁর নামে 'নুর-জামাল' নামক একখানি পুথি পাওয়া যায়। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে মাহে-নও পত্রিকায় এই পুথি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। তবে কবির সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য সাহিত্যবিশারদ দেননি।

মধ্যযুগের অন্যান্য কবির মতো কবি হাজী মুহম্মদও কাব্যে নিজের সম্পর্কে কোনো তথ্য বিধৃত করেননি। এর ফলস্বরূপ তাঁর সময়কাল নির্ণয়ে নির্ভর করতে হয় পরোক্ষ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। এনামুল হকের মতে - "হাজী মুহম্মদ আমাদের একজন প্রাচীন কবি। তিনি কবি সেখ পরাণ (১৫৬০-১৬২৫) ও সৈয়দ সুলতানের (১৫৫০-১৬৪৮) সমসাময়িক তো বটেই, তাঁহাদের কিঞ্চিত পূর্ববর্তী লোকও হইতে পারেন।" [২৫] শেখ পরাণের 'নসিহৎনামা'য় কবি হাজী মুহম্মদের উল্লেখ পাওয়া যায় : ছুরতনামার মধ্যে ঈমানে ছিফত।/রচিছেন্ত হাজী মোহম্মদ ভাল মত।।/তে কারণে এথা মুঞি ন কৈলু

সমাপ্ত।/কিঞ্চিত কহিলুং বুঝিতে ইঙ্গিত।।/সএক পরাণে কহে শুন গুনিগণ।/সভানের পদতলে করম নিবেদন।।[২৬]

শেখ পরাণের কাব্যে হাজী মুহম্মদের উল্লেখ থেকে তাঁর প্রাচীনতত্বের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তিনি শেখ পরাণের সমসাময়িক বিখ্যাত কবি বা তাঁর পূর্ববর্তী বয়োজ্যেষ্ঠ কবিও হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন-"আমরা তাঁহার আবির্ভাব-কাল ১৫৫০ হইতে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।"[২৭]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে কবি 'নূর-জামাল' ব্যতীত আরও একখানা কাব্য রচনা করেছিলেন, কাব্যের নাম 'ছুরতনামা'। এই কাব্যের বিষয়ও ধর্মকেন্দ্রিক। তবে সম্ভবত কবি মুসলমান সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন 'নূর-জামাল' কাব্যের জন্যই। কাব্যের মধ্যে শরিয়তের নানা তত্ত্বের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে তেমনি ভাবে উঠে এসেছে তরীকৎ বা মারফতের কথা।

কাব্যের প্রথমভাগে শরিয়তি অংশে কবি তওবার ফজিলত বা মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন : এবাদত কর হেন জান সে আপন।/বিনি তওবায় ফল নহে কদাচন।।/যে করিলা গুনা-খাতা তওবা কর তারে।/আশা না করিহ পরে তওবা করিবারে।।/তওবা করিলে গুনা বকশিব আল্লাএ।/যদি আর সেই গুনা না করে বান্দায়।।/অকর্ম যে না করিহ আপনে জানিতে।/লোক সঙ্গে অনুক্ষণ থাকিহ পীরিতে।।[২৮]

দ্বিতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে তরিকত বা মারফতির বিভিন্ন তত্ত্ব কথা। মারফতির বিভিন্ন মোকাম যথা—লাহুৎ, নাসুৎ, মলকুৎ, জবরূৎ প্রভৃতি একটির পর একটি স্তর পেরিয়ে কীভাবে সহজে সিদ্ধি লাভ করা যায় তার নানা দার্শনিক ব্যাখ্যা এই অংশে কবি দিয়েছেন। মলকূৎ-মকাম লাভ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন : নূর-জামালে কহে মাতিনে অনুক্ষণ।/আল্লা পরে আর কিছু না কল্পয়ে মন।।/দুনিয়ার সুখভোগে জন নহে ভোলা।/হামিসা ছাহেব সাথে হবে ওলামেলো।।/হক্কেতে ডুবিয়া মন থাকে অনুক্ষণ।/আপনারে আপনে হারায় ততক্ষণ।।/এইরূপ হাল যদি হইল বান্দার।/মলকুত হাসিল তবে হইল তাহার।।[২৯]

নূর-জামাল বা জামালী-নূর গোপন অবস্থায় থেকে মলকূৎ-মকাম লাভের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এই অবস্থায় সাধকের মন আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করে না, তবে পার্থিব সুখকেও সে বর্জন করে চলে এমন নয়। সাধক সর্বদা সঙ্গীদের সাথে মেলামেশা করেন, তাঁর মন সবসময় সৎপথে থেকে সত্যের সন্ধানে নিজেকে নিজেই হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত হয়। সাধকের এ রকম অবস্থা হলেই মলকুৎ -মোকাম লাভ হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কবি বলেছেন : জাত ও ছিফাত সেই নূর অনুপাম।/নূর মোহাম্মদ তান রাখিলেক নাম।।/আপনার দোস্ত হেন তাহারে বলিলা।/সেই নূর হোন্তে আল্লা সকল সৃজিলা।।/এক হোন্তে হৈল দুই, দুই হোন্তে সকল।/বী হোন্তে বৃক্ষ যেন, বৃক্ষ হোন্তে ফল।।[৩০]

'তৌহীদূ-ই-অজুদী' ও 'তৌহীদ-ই-শহূদী'-র তত্ত্বও স্থান পেয়েছে এই অংশে। এই তত্ত্বের মূল কথা হল খোদা এবং তাঁর বান্দা অভিন্ন, তা সত্ত্বেও বান্দাকে খোদা বলা যায়

না। তাত্ত্বিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন : এক হোন্তে হৈল দুই, দুই হোন্তে সকল।/বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন, বৃক্ষ হোন্তে ফল।।/ফল বৃক্ষ বীজ এই তিন নাম হয়।/এক হয়ে তিন জান তিনে এক হয়।।/বীজ বৃক্ষ হোন্তে কেহ ভিন্ন নয়।/তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যায়।।/তেন মতে জানিহ আল্লা আর বন্দা।/আল্লা হোন্তে বন্দা সব হইয়াছে পদ।।/ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কায়।/তেনরূপে জানি সে বান্দা আর খোদায়।।

এইভাবে কবি তৎসময়ের মুসলমান সমাজকে নানা ধর্মীয় উপদেশ দান করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কাব্য রচনার উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করেছেন। সেই সময়ে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিম সমাজের যে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি ছিল তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে : হিন্দু আনি অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা।।/বাংলা অক্ষর পরে আঞ্জি মহাধন।/তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ।।/যে আঞ্জি পীর সবে করিছে বাখান।/কিঞ্চিত যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ।।/যেন তেন মতে সে জানৌক রাত্র দিন।/দেশি ভাষা দেখি না করিও ঘিন।।[৩১] বাংলা ভাষার প্রতি কবির এই বিবৃতি মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসারই প্রকাশ ঘটিয়েছে।

নেয়াজ

কবি পরাণের মতো নেয়াজও পুত্র সূত্রেই পরিচিত। পুত্র আশরাফ তাঁর কাব্যের ভণিতায় পিতৃনাম যোগ করেছেন সেই সূত্রেই তিনি এই ধারার কবিরূপে পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর কাব্যের নাম 'কায়দানী কিতাব'। বিষয় ইসলামি ধর্মসংক্রান্ত নানা তত্ত্বকথা। ড. আহমদ শরীফ মনে করেন কবি সতেরো শতক বা তাঁরও পূর্ববর্তী সময়ের কবি হতে পারেন।

আশরাফ

কবি আশরাফ রচিত গ্রন্থের নাম 'কিফায়তুল মুসলেমিন'। কাব্যটির প্রথম দিকে ঘোলোটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি বলে কবির পূর্ণ পরিচয় জানা যায় না। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন নামাজের ফজলিয়ত বা পুণ্য। বিশেষ করে রমজান মাসে কোন দিন কীভাবে কত রাকাত অতিরিক্ত নামাজ পড়তে হয় এবং তার ফল 'শব-ই-কদর' নামাজের উপকার ইত্যাদি।

'শব-ই-কদর' সম্পর্কে কবি কিছু বিরল তত্ত্ব ও তথ্য দিয়েছেন কাব্যের মধ্যে। মঙ্গলবার প্রথম রমজান পড়লে কদর হবে সাতাইশে, বুধবার হলে হবে বাইশে, বৃহস্পতিবার হলে পঁচিশে, শুক্রবার হলে ছাব্বিশে, শনিবার হলে কদর হবে তেইশে রমজান।

পুথির লিপিকাল ১১৫০ মঘী ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ। কবি ছিলেন নেয়াজের পুত্র ও মুহম্মদ আবীদের মুরিদ। ভণিতায় কবি শেখ মুরীদের মতো আশরাফও পিতৃনাম যোগ করেছেন : "জনক চরণ চুম্বি আশরাফ বাওয়া/কহন্ত নামাজ কথা রসুলের শরা।/সাফল্য জনম শেখ মোহাম্মদ নেয়াজ /জীববন্তে না তেজিল এ রোজা নামাজ।/তাহান আদেশে ছিরি আশরাফ হীন/কহন্ত নামাজ কথা কারণে মুমীন।"[৩২] (কিফায়তুল মুসলেমিন)

মুত্তালিবের মতো আশরাফের কাব্যেও ভণিতায় পিতৃনামের অনুকৃতি দেখে আহমদ

শরীফ তাঁকে কবি মুত্তালিবের পরবর্তী কবি বলে মনে করেন। আশরাফ পিতা নেয়াজের আগ্রহ এবং পীর মুহম্মদ আবিদের আদেশেই কাব্যটি রচনা করেন। তা তাঁর কাব্য থেকেই জানা যায় :মোহম্মদ আবিদ শাহা ভক্ত ভাগ্যবন্ত /নিরবধি ভাবে চিত্তে আখেরের পন্থ।/কিফায়তুল মুসলেমিন পুণ্যের কথন/মুসলমান হেতু কৈল পঞ্চালি রচন।/দীন ইসলাম হেতু এথ যত্নভাব/নহে পঞ্চালিকা কৈলে কি ফল কি লাভ।[৩৩] (কিফায়তুল মুসলেমিন)

সৈয়দ আলাওল

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধর্মী কাব্য রচনার পাশাপাশি ইসলামি অনুশাসনমূলক কাব্য রচনা করে মুসলমান সমাজে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন সৈয়দ আলাওল। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'তোহ্ফা'। ইউসুফ গ'দার "তোহফাতুন্নেসায়েহ" থেকে অনূদিত। ইউসুফ গ'দার কাব্যটিও মৌলিক রচনা নয়। এর অবলম্বন কোনো আরবি 'হেদায়া'। ইউসুফ গ'দার তুলনায় আলাওলের 'তোহফা'র বিশেষত্ব এতে কোরান, হাদিসের পাশাপাশি লৌকিক বিশ্বাস সংস্কার সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচারের প্রসঙ্গ আছে। যথা—বিয়ে সম্বন্ধে : (যে নারী) অতি স্থুল, পুষ্টকায়া, অধিক দূর্বল।/কর পদে লোমাবলী থাকে যে সকল।।/না ঢাকএ মস্তক, সাক্ষাতে দেএ গালি।/অন্ধকার রাখে গৃহ প্রদীপ না জ্বালি।।/দাসী ভাবে মনে করে ঈশ্বরের কর্ম।/কেলি-রস হেতু যদি ডাকে প্রিয়ভাষে।/করিয়া পীড়ার ছল নিকটে না আসে।।/(তার চেয়ে) আপনা হরিষে যদি চাহ চিরকাল।/কিনিয়া সুন্দর দাসী গোঙাইলে ভাল।।/সদা ত্রাসযুক্ত থাকে বুঝে কার্য-মর্ম। [৩৪] বিদ্যা ও আত্ম নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে :"নানা বিদ্যা পঠ, শিখ, কর দু:খ কাজ।/লজ্জা না করিও তাহে মাগিলে সে লাজ।/বিদ্যাগুণ না জানিলে ভ্রমে দ্বারে দ্বারে।/গর্দভ বলদ সম যে আলস্য করে।।/পৃষ্ঠে মুণ্ডে আনিব গর্দভ শিলা।/পরগৃহে অন্ন হোতে শতগুণে ভালা।"[৩৫] ভিখারির প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে : "কৃপা ভাবে ভিক্ষুক করিলে এক দৃষ্টি।/তোমা পরে ঈশ্বরে করিব কৃপা বৃষ্টি।।/নিজ অঙ্গে দুঃখ সহে পর দুঃখ লাগি।/তার সম কেহ নহে প্রভু-কৃপা-ভাগী।।/দ্বারে আসি ভিক্ষুকে মাগিলে এক রুটি।/না দিয়া ফিরাএ যদি নষ্ট পরিপাটি।।/ঈশ্বরে বোলএ আমি গেঁলু তোর দ্বারে।/এক গ্রাস ভক্ষ্য তুমি না দিলা আমারে।।/দ্বার হোন্তে কেহ যদি মাঙয়া খেদাএ।/মোকে খেদাইলে হেন বোলএ খোদাএ।।/গ্রাস এক না দিয়া খেদাএ ভিক্ষুক।/সহস্র বৎসর দোজখেত পাইব দুঃখ।।"[৩৬] লৌকিক সংস্কার সম্বন্ধে : না লেপিঅ ঘর বাড়ি গো-লাদ মিশ্রিত।/ফেরেস্তা না আস কাছে জানিহ নিশ্চিত।।

মধ্যযুগের অন্যান্য কবির মতো আলাওল রচনার সন তারিখ নিয়ে কোনো খেদ আমাদের রাখেননি। 'তোহফা' রচনার সমাপ্তিকাল :"পুস্তক সমাপ্ত সং সন মুছলমানি।/রসাসিদ্ধি রামাধির লও পরিমানি।/পক্ক সাবানের চর্তুদশ দিন সোমবার।/সম্মুখ বরাত নিসি সুব যোগ সার।।/তরুণ অরুণ সমে বেলা দুই জাম।/তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম।।/মগদের সন সংক্ষ বুঝহ নিন্যএ।/রিভু জোগ অব্র (অম্ল) এক বসন্ত মসএ।।/পুস্তক সমাপ্ত সংখ্যা শুন মোছলমানি।/রসসিন্ধু রমধিক লএ পরিমাণি।।/সমুখে বরাত নিসি সুভ যোগ সার।।/তরুণ

অরুণ সঙ্গে বেলা জাম।/তত্ত্ব উপদেশ করি পোস্তকের নাম।/মগদের সন সংখ্যা বুজহন্নিএ।/রিতু যোগ অম্রেত যে বসন্ত সমএ।।/ফাল্গুন মাসেত জান চতুর্থ বিংশ সম।/সমাপ্ত হইল পোস্তক মনোরম।"[৩৭] ড. আহমদ শরীফ উপরোক্ত স্তবকের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ ভাবে-মুসলমানি সন : রাম-৩, সিন্দু-৭, নবধিক (নব অধিক)-১০। অঙ্কস্য বামা গতি নিয়মে ১০৭৩ বা ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ। মঘী সন: ঋতু-৬, যুগ-২, অভ্র-০, এক-১। এ ভাবে ১০২৬ মঘী বা ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ হয়। অতএব ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে তোহফার অনুবাদ কার্য শুরু হয়ে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে শেষ হয়।[৩৮]

সৈয়দ নুরুদ্দিন

সৈয়দ নুরুদ্দিনের নামে চার খানি কাব্য পাওয়া যায়-১ 'দাকায়েক আখবার' ২. 'রাহাতুল কুলুব বা 'কেয়ামত নামা' ৩. 'বুরহানুল আরেফিন বা হিতোপদেশ' ৪. 'মুসার সওয়াল'। ড. আহমদ শরীফের মতে-'সৈয়দ নুরুদ্দিন আঠারো শতকের শেষার্ধের লোক এবং গ্রন্থগুলো আঠারো শতকের শেষ দশকে ও অন্তিম লগ্নে রচিত।'[৩৯]

চারখানি কাব্যই ইসলামি ধর্মসংক্রান্ত। প্রথম কাব্য 'দাকায়েক আখবার' আরবি শব্দ 'দাকায়েক' নামের 'ফিকাহ্' গ্রন্থের স্বাধীন অনুবাদ। কাব্যের বর্ণিতব্য বিষয় মৃত্যু, মৃত্যুর জিকির, বুহর তফসীর, প্রাণ হরণ, আজরাইল, মুমূর্ষুর প্রয়াণ, রুহুর দুঃখ, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার, গোর যন্ত্রণা-মনকির-নকির প্রভৃতি। গ্রন্থটি বাইশ পর্বে বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

'রাহাতুল কুলুব বা কেয়ামত নামা', আহমদ শরীফের মতে 'বুরহানুল আরেফিন'-এর অংশ। কবি এতে ইসলামি অনুশাসনের পাশাপাশি সামাজিক বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। কাব্যের মধ্যে যেমন রোজা, নামাজ, সুরার কথা, কোরান পাঠের কথা এসেছে তেমনি এসেছে মাতা পিতার কথা, সুদ খোরের কথা, স্ত্রী-পুরুষের দায়িত্ব-কর্তব্য, মিথ্যাভাষণ, পরচর্চা-পরহিংসার দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি।

'মুসার সওয়াল' এ কবি নবি মুসার ও আল্লাহ্-র জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তত্ত্বমূলক —আলোচনা করেছেন।

নসরুল্লাহ খোন্দকার

কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার ছিলেন চট্টগ্রামের আধুনিক বাঁশখালি থানার অর্ন্তগত জলদী গ্রাম নিবাসী। তাঁর নামে তিনখানি পুথি প্রচলিত-'জঙ্গনামা', 'শরীয়ত নামা' ও 'মুসার সওয়াল'।

কাজী বদিউদ্দীন

'কায়দানী কিতাব' ও 'সিফৎ-ই-ইমান'-এর রচয়িতা কাজী বদিউদ্দীন। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া থানা সংলগ্ন বহুলী গ্রাম নিবাসী ছিলেন। তিনি সম্ভবত আঠারো শতকের কবি। তাঁর রচিত দুটি কাব্যই ইসলামি অনুশাসন বিষয়ক। আঠারো শতকের মধ্যে এই ধারায় আরও অনেক কবিই কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — মুহম্মদ জান, আজমত আলী, আব্দুল্লাহ, সেখ সোলায়মান, বালক ফকির প্রমুখ।

শেখ মুত্তালিব

এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি এবং বহুল আলোচিত কবি হলেন শেখ মুত্তালিব। তাঁর নামে প্রচলিত পুথি চট্টগ্রামের নানা স্থান থেকে সংগৃহীত হয়েছে। পুথির বহুল প্রচলন দেখে অনুমান করা যায় যে তিনি তৎসময়ে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁর নামে দুটি পুথি প্রচলিত — 'কায়দানী কিতাব' ও 'কিফায়তুল মুসল্লিন'।

কবি পরাণের পুত্র শেখ মুত্তালিব, জন্মস্থান চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডুতে। অল্প বয়সে কবি পিতৃহীন হয়েছিলেন বলে কাব্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। 'কায়দানী কিতাব' এ কবি নিজের শৈশব এবং সাংসারিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন—"পড়িবার অক্তে বাপ মরি গেল মোর।/গৃহবাস 'বালা' আর দুনিয়ার বেভার/বেড়িল আপদে মোর দরস্ মাঝার।/এইজন্য পড়িবারে নারিলুঁ বিস্তর/অল্প অল্প জানিলুঁ শরার খবর।" কবি শৈশবে পিতৃহীন হয়ে অল্প বয়সে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সেই সময়ে নানা বিপদ সংকটের মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কাটে। তাই শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁকে মাদ্রাসা ত্যাগ করতে হয়।

আরবি আবজাদ রীতিতে কবি তাঁর গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করেছেন —১। "এসলামে এবাদত নামাজ সমাপ্ত /সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত।/সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম/যেই দিনে সাঙ্গ হইল পুস্তক তামাম।" ২। "পুস্তক সমাপ্ত হৈল দীন ইসলাম/কিফায়তুল মুসলিম রাখিলাম নাম।"

ড. মুহম্মদ এনামুল হক উপরোক্ত স্তবকের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ ভাবে—'আরবী আবজাদ রীতি অনুসারে পুস্তক সমাপ্তির তারিখ এইরূপ : ইবাদৎ-৪৭৭, নাম-৯১, তামাম-৪৮১, অর্থাৎ ১০৪৯ হিজরী বা ১৬৩৯ খ্রী.'।[৪০] ড. আহমদ শরীফও মনে করেন ১০৪৮ ও ১০৪৯ হিজরী তথা ১৬৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাব্যটি রচিত হয়েছিল।[৪১] এই হিসেব অনুযায়ী বলা যায় কবি মুত্তালিব সপ্তদশ শতকের মধ্যে আর্বিভূত হয়েছিলেন।

সূত্রনির্দেশ

১. কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব, শেখ মুত্তালিব (আহমদ শরীফ সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আগস্ট ১৯৭৮
২. ঐ
৩. ঐ
৪. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, ১ম খণ্ড , বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম — ১৯৮৯, পৃ. ৫
৫. কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব, শেখ মুত্তালিব (আহমদ শরীফ সম্পাদিত)
৬. মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৫, পৃ. ১২৯
৭. ঐ পৃ.১৩০
৮. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সং ১৯৭৮, পৃ.৩০৬।
৯. কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব, শেখ মুত্তালিব (আহমদ শরীফ সম্পাদিত), ভূমিকা, পৃ.১২

১০. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, পৃ. ১১০
১১. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য
১২. মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ৫৪
১৩. ঐ, পৃ. ৫৪
১৪. ঐ, পৃ. ৫৪
১৫. ঐ, পৃ. ৫৪
১৬. ঐ, পৃ. ৫৪
১৭. ঐ, পৃ. ৫৪
১৮. ঐ, পৃ. ৫৫
১৯. ঐ, পৃ. ৫৫
২০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, আজাহার ইসলাম, বাংলা একাডমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯২, পৃ.৫৭।
২১. ঐ, পৃ. ৫৭
২২. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পৃ. ৩২৬
২৩. ঐ, পৃ. ৩২৬
২৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, পৃ. ৫৫
২৫. ঐ, পৃ. ১১০
২৬. কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব, শেখ মুত্তালিব (আহমদ শরীফ সম্পাদিত), ভূমিকা, পৃ.৩২
২৭. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১১০
২৮. ঐ, পৃ. ১১০
২৯. ঐ, পৃ. ১১০
৩০. ঐ, পৃ. ১১০
৩১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি , পৃ.৯৩
৩২. কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব, শেখ মুত্তালিব (আহমদ শরীফ সম্পাদিত) ভূমিকা, পৃ.২৩
৩৩. ঐ, পৃ. ২৪
৩৪. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পৃ. ৩২
৩৫. ঐ, পৃ. ৩১২
৩৬. ঐ, পৃ. ৩১৩
৩৭. ঐ, পৃ. ৩১২
৩৮. ঐ, পৃ. ৩১২
৩৯. ঐ, পৃ. ৩১৮
৪০. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১২৯
৪১. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পৃ. ৩১৮